

তাহীমুল কুরআনের ভূমিকা

কুরআন পাঠকের সংকট

শিরোনামে ‘ভূমিকা’ শব্দটি দেখে কুরআন মজীদের ভূমিকা লিখতে বসে গেছি বলে ভুল ধারণা করার কোন কারণ নেই। এটা কুরআনের নয় বরং তাহীমুল কুরআনের ভূমিকা। দু’টি উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমি এ ভূমিকা লেখায় হাত দিয়েছি।

একঃ কুরআন অধ্যয়নের আগে একজন সাধারণ পাঠককে এমন কিছু কথা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যেগুলো শুরুতেই জেনে নিলে তার পক্ষে কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হয়ে যায়। নয়তো কুরআন অধ্যয়নের মাঝখানে বারবার একথাগুলো তার মনে সন্দেহ সঞ্চার করতে পারে। অনেক সময় শুধুমাত্র এগুলো না বুঝার কারণে মানুষ কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থের কেবলমাত্র উপরিভাগে আসতে থাকে বছরের পর বছর ধরে। ভেতরে প্রবেশ করার আর কোন পথই খুঁজে পায় না।

দুইঃ কুরআন বুঝার চেষ্টা করার সময় মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলো উদয় হয় সর্বপ্রথম সেগুলোর জবাব দেবো যে গুলোর প্রথম প্রথম আমার মনে জেগেছিল অথবা পরে আমার সামনে আসে।

কুরআন পাঠকের সংকট

সাধারণত আমরা যেসব বই পড়ে থাকি তাতে থাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। একটি বিশেষ রচনামূলক আওতায় এ বিষয়বস্তুর ওপর ধারাবাহিকভাবে তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং বিভিন্ন মতামত ও যুক্তির অবতারণা করা হয়। এ জন্য কুরআনের সাথে এখনো পরিচয় হয়নি এমন কোন ব্যক্তি যখন প্রথমবার এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে যান তখন তিনি একটি চিরাচরিত আশা নিয়েই এগিয়ে যান। তিনি মনে করেন, সাধারণ গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও প্রথম বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকবে, তারপর মূল আলোচ্য বিষয়কে অধ্যয়ন ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে বিন্যাসের ক্রমানুসারে এক একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে। এভাবে জীবনের এক একটি বিভাগকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিন্যাসের ক্রমানুসারে বিধান ও নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু গ্রন্থটি খুলে পড়া শুরু করার পর তিনি দেখেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। তিনি এখানে দেখেন এমন একটি বর্ণনাভঙ্গী যার সাথে ইতিপূর্বে তার কোন পরিচয় ছিল না। এখানে তিনি দেখেন আকীদা - বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়াবলী, নৈতিক বিধি-নির্দেশ, শরীয়াতের বিধান, দাওয়াত, উপদেশ, সতর্কবাণী, সমালোচনা-পর্যালোচনা, নিন্দা-তিরস্কার, ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ সান্ত্বনা, যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষ্য এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি ইংগিত। এগুলো বার বার একের পর এক আসছে। একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন শব্দের মোড়কে পুনর্ব্যাক্ত করা হচ্ছে। একটি বিষয়বস্তুর পর আর একটি এবং তারপর আকাঙ্ক্ষিতভাবে তৃতীয় আর একটি বিষয়বস্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে। বরং কখনো কখনো একটি বিষয়বস্তুর মাঝখানে একটি বিষয়বস্তু অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ছে। বাক্যের প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষের দিক পরিবর্তন হচ্ছে বার বার এবং বক্তব্য বার বার মোড় পরিবর্তন করছে। বিষয়বস্তুগুলোকে অধ্যয়ন ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করার কোনো চিন্তাও নেই। ইতিহাস লেখার পদ্ধতিতে কোথাও ইতিহাস লেখা হয়নি। দর্শন ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের ভাষায় লেখা হয়নি। মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের বস্তু ও পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু জীববিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে করা হয়নি। সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তাতে সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আইনগত বিধান ও আইনের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে আইনবিদদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে। নৈতিকতার যে শিক্ষা বিবৃত হয়েছে তার বর্ণনাভঙ্গী নৈতিক দর্শন সম্পর্কিত বইপত্রে আলোচিত বর্ণনাভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধারণভাবে বইপত্রে যেভাবে লেখা হয় এসব কিছুই তার বিপরীত। এ দৃশ্য একজন পাঠককে বিব্রত করে। তিনি মনে করতে থাকেন, এটি একটি অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের সমষ্টি এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য ‘খণ্ড’ একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলোকে ধারাবাহিক রচনা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিরোধিতার দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়নকারীরা এরই উপর রাখেন তাদের সকল আপত্তি, অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয়ের ভিত। অন্যদিকে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারীরা কখনো অর্থের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে সন্দেহ সংশয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। কখনো কখনো তারা এই আপাত অবিন্যস্ত উপস্থাপনার ব্যাখ্যা করে নিজেদের মনকে বুঝাতে সক্ষম হন। কখনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন আবার কখনো ‘খণ্ড রচনার’ মতবাদটি গ্রহণ করে নেন, যার ফলে প্রত্যেকটি আয়াত তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা হয়ে বক্তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অর্থ প্রকাশ করতে থাকে।

আবার একটি বইকে ভালোভাবে বুঝতে হলে পাঠককে জানতে হবে তার বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য , মূল বক্তব্য ও দাবী এবং তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে তার বর্ণনা পদ্ধতির সাথেও পরিচিত হতে হবে। তার পরিভাষা বিশেষ বিশ্লেষণ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। শব্দের উপরি কাঠামোর পেছনে তার বর্ণনাগুলো যেসব অবস্থা ও বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোও চোখের সামনে থাকতে হবে। সাধারণত যেসব বই আমরা পড়ে থাকি তার মধ্যে এগুলো সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই তাদের বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হয় না। কিন্তু অন্যান্য বইতে আমরা এগুলো যেভাবে পেতে অভ্যস্ত কুরআনে ঠিক সেভাবে পাওয়া যায় না। তাই একজন সাধারণ বই পাঠকের মানসিকতা নিয়ে যখন আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকেন তখন তিনি খুঁজে পান না এই কিতাবের বিষয়বস্তু , মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিও তার কাছে নতুন ও অপরিচিত মনে হয়। অধিকাংশ জায়গায় এর বাক্য ও বক্তব্যগুলোর পটভূমিও তার চোখের আড়ালে থাকে। ফলে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আয়াতের মধ্যে জ্ঞানের যে উজ্জ্বল মুক্তোমালা জড়িয়ে রয়েছে তা থেকে কম বেশী কিছুটা লাভবান হওয়া সত্ত্বেও পাঠক আল্লাহর কালামের যথার্থ অন্তর্নিহিত প্রাণসত্তার সন্ধান পায় না। এ ক্ষেত্রে কিতাবের জ্ঞান লাভ করার পরিবর্তে তাকে নিছক কিতাবের কতিপয় বিক্ষিপ্ত তত্ত্ব ও উপদেশাবলী লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বরং কুরআন অধ্যয়নের পর যেসব লোকের মনে নানা কারণে সন্দেহ জাগে তাদের অধিকাংশের বিভ্রান্তির একটি কারণ হচ্ছে এই যে , কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করার ব্যাপারে এই মৌখিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের জানা থাকে না। এরপরও কুরআন পড়তে দিয়ে তারা দেখে তার পাতায় পাতায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে। বহু আয়াতের গভীর অর্থ তাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে। অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে তারা জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেয়েছে কিন্তু আয়াতের পূর্বপর আলোচনার প্রেক্ষিতে এই বক্তব্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ বেমানান মনে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বর্ণনাভংগীর সাথে অপরিচিত থাকার কারণে আয়াতের আসল অর্থ থেকে তারা অন্যদিকে সরে গিয়েছে এবং অধিকাংশ স্থানে পটভূমি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এভাবে তারা মারাত্মক ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

সংকট উত্তরণের উপায়

কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব? এটি কিতাবে অবতীর্ণ হলো? এর সংকলন ও বিন্যাসের পদ্ধতি কি ছিল? এর বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় কি? কোন কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে এর অসংখ্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়ালী সম্পর্কিত? নিচের বক্তব্য উপস্থাপন পদ্ধতি ও সপ্রমাণ করার জন্য এতে কোন ধরনের বর্ণনাধারা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর এবং এই ধরনের আরো কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব যদি পাঠক শুরুতেই পেয়ে যান তাহলে তিনি বহুবিধ আশংকা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। তার জন্য কুরআনের অর্থ অনুধাবন ও তার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পথ প্রশস্ত হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদে প্রচলিত গ্রন্থের ন্যায় রচনা বিন্যাসের সন্ধান করেন এবং এর পাতায় তার সাক্ষাত না পেয়ে চতুর্দিকে হাতড়াতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়েন, কুরআন সম্পর্কিত এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব জানা না থাকাই তার মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ। “ধর্ম সম্পর্কিত” একটি বই পড়তে যাচ্ছেন - এই ধারণা নিয়ে তিনি কুরআন পড়তে শুরু করেন। “ধর্মসম্পর্কিত” এবং “বই” এ দু’টোর ব্যাপারে তার মনে সাধারণত ধর্ম ও বই সম্পর্কিত ধারণাই বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখন সেখানে নিজের মানসিক ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র তিনি দেখতে পান তখন তাঁর কাছে সেটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হতে থাকে। আলোচ্য বিষয়ের মূল কথার নাগাল না পাওয়ার কারণে প্রতিটি বাক্যের মধ্যে তিনি এমনভাবে বিভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করতে থাকেন যেন মনে হয় যে , আপনি যে কিতাবটি পড়তে যাচ্ছেন সেটি বইপত্রের জগতে কেটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব বই। এটির রচনাপদ্ধতিও স্বাভাবিক ও বৈশিষ্টমণ্ডিত। বিষয়বস্তু, বক্তব্য বিষয় ও আলোচনা বিন্যাসের দিক দিয়েও এখানে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কাজেই এতদিন পর্যন্ত নানা ধরনের বইপত্র পড়ে আপনার মনে বই সম্পর্কে যে একটি কাঠামোগত ধারণা গড়ে উঠেছে , এ কিতাবটি বুঝার ব্যাপারে তা আপনার কোন কাজে লাগবে না। বরং উলটো এ ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একে বুঝতে হলে নিজের মনের মধ্যে আগে থেকেই যে সব ধারণা ও কল্পনা বাসা বেঁধে আছে সেগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে এবং এই কিতাবের অভিনব বৈশিষ্ট্যকে নিজের মনের মধ্যে পৌঁছে নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই। তবে এ কিতাবকে বুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মূল বিষয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপ:

১. সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার , বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দে মধ্য পার্থক্য করার , নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে একথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন: আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ইচ্ছাতির দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাঁচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ।

তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই: তোমারা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমারা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমারা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন মর্মজ্বালা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্ভে তোমারা নিষ্কিণ্ত হবে।

৩. একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব-জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা, ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি হননি। তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর অনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাদের সন্তাদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হিসাবে জীবন যাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি (অর্থাৎ দীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ-কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইলম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরীয়াত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোকপ্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈর করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যমীন জুলুম-নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাশুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে সেটি হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল সৃষ্টির প্রথমদিকে থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ-সুবিধে দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সম্ভ্রুটি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এদেরকে তান কসে তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দ্বীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথমদিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিক ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। তারপর যারা এ আহ্বান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উন্মুক্ত পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর

আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়ম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সূচারুপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উন্মাদে মুসলিমার অংগীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোন কোন উন্মাদ আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সবশেষে বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের প্রথলুস্ত উন্মাদদেরকেও তিনি আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌছিয়ে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উন্মাদে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যেন একদিকে আল্লাহর হেদায়াতের উপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হেদায়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ এই কিতাবটি অবতীর্ণ করেন।

কুরআনের মূল আলোচ্য

কুরআন সম্পর্কিত এই প্রাথমিক কথাগুলো জেনে নেয়ার পর পাঠকের জন্য এই কিতাবের বিষয়বস্তু , এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্যবিন্দু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

এর বিষয়বস্তু মানুষ। প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে-একথাই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু।

এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে , আপাত দৃষ্টি , আন্দাজ-অনুমান নির্ভরতা অথবা প্রকৃতির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ , বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ গড়ে তুলেছে এবং ঐ মতবাদগুলোর ভিত্তিতে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে যথার্থ জাজ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা মানুষের জন্য ধ্বংসকর। আসল সত্য তাই যা মানুষকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আর এই আসল সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য ইতপূর্বে সঠিক কর্মনীতি নামে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতির আলোচনা করা হয়েছে তাই সঠিক, নির্ভুল ও শুভ পরিণতির দাবীদার।

এ চূড়ান্ত লক্ষ্য ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর হেদায়াতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা। মানুষ নিজের গাফলতি ও অসতর্কতার দরুন এগুলো হারিয়ে ফেলেছে এবং তার শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে সে এগুলোকে বিভিন্ন সময় বিকৃত করার কাজই করে এসেছে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআন পাঠ করতে থাকলে দেখা যাবে এই কিতাবটি তার সমগ্র পরিসরে কোথাও তার বিষয়বস্তু , কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণে সরে পড়েনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলী তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি মোতির মালার বিভিন্ন রংয়ের ছোট বড় মোতি একটি সূতোর বাঁধনে এক সাথে একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয় পৃথিবী ও আকাশের গঠনাকৃতির , মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া পদ্ধতি এবং বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়। অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। এই সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়। কিন্তু মানুষকে পদার্থ বিদ্যা , জীব বিজ্ঞান , ইতিহাস , দর্শন বা অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাজ্বল্যমান সত্য সম্পর্ক মানুষের ভুল ধারণা দূর করা , যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া , যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সূক্ষ্ম করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহ্বান করাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততটুকুই এবং সেই ভংগিমায় করা হয়েছে যতটুকু এবং যে ভংগিমায় আলোচনা করা তার মূল লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সবসময় অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। একটি সুগভীর ঐক্য একাত্মতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা 'ইসলাম দাওয়াত'- এর কেন্দ্রবিন্দুতে ঘুরছে।

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিন্যাস রীতি ও তার বহুতর আলোচ্য বিষয়কে পুরোপুরি হৃদয়ংগম করতে হলে তার অবতরণের রীতি-পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে হবে।

মহান আল্লাহ এই কুরআনটি একবারে লিখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে দিয়ে এর বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটি বিশেষ জীবন ধারার দিকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দেননি। এটি আদৌ তেমন কোন কিতাব নয়। অনুরূপভাবে এই কিতাবে প্রচলিত রচনা পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়নি। এ জন্য রচনা বিন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে বই লেখা হয় তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আসলে এটি একটি অভিনব ধরনের কিতাব। মহান আল্লাহ আরব দেশের মক্কা নগরীতে তাঁর এক বান্দাকে নবী করে পাঠালেন নিজের শহর ও গোত্র (কুরাইশ) থেকে দাওয়াতের সূচনা করার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। এ কাজ শুরু করার জন্য প্রথম দিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিধানগুলোই তাকে দেয়া হলো। এ বিধানগুলো ছিল প্রধানত তিনটি বিষয়বস্তু সম্বলিত।

এক: নবীকে শিক্ষা দান। এই বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন কররা জন্য তিনি নিজেকে কিভাবে তৈরি করবেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করবেন তা তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হলো।

দুই: যথার্থ সত্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাবলী সরবরাহ এবং সত্য সম্পর্কে চারপাশের লোকদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো পাওয়া যেতো সংক্ষেপে সেগুলো খন্ডন। এগুলোর কারণে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করতো।

তিন: সঠিক কর্মনীতি দিকে আহ্বান। আল্লাহর বিধানের যেসব মৌলিক চরিত্র নীতির অনুসরণ মানুষের জন্য কল্যান ও সৌভাগ্যের বার্তাবহ সেগুলো বিবৃত করা হলো।

ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব

প্রথম দিকের এ বাণীগুলো দাওয়াতের সূচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। এগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাজ্ঞল, মিষ্টি-মধুর, ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এবং যে জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তাদের রুচি অনুযায়ী সর্বোত্তম সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। ফলে একথাগুলো মনে গেঁথে যেতো তীরের মতো। ভাষার ঝংকার ও সুর লালিত্যের কারণে এগুলোর দিকে কান নিজে নিজেই অতি দ্রুত আকৃষ্ট হতো। সময়োপযোগী এবং মনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে জিহ্বা স্বতস্ফূর্তভাবে এগুলোর পুনরাবৃত্তি করতো। আবার এতে স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশী। বিশ্বজনীন সত্য বর্ণনা করা হলেও সে জন্য যুক্তি, প্রমাণ ও উদাহরণ গ্রহণ করা হতো এমন নিকটতম পরিবেশ থেকে যার সাথে শ্রোতার ভালোভাবে পরিচিত ছিল। তাদেরই ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাদেরই প্রতিদিনের দেখা নিদর্শনসমূহ এবং তাদেরই আত্মদাগত, নৈতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যগুলোর ওপর ছিল সমস্ত আলোচনার ভিত্তি। এভাবে এর প্রভাব গ্রহণ করার জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াতের এ সূচনা পর্বটি প্রায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত জারী ছিল। এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

১. কতিপয় সংকর্মশীল ব্যক্তি ইসলামী দাওয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা ‘মুসলিম উন্মাহ’ নামে একটি উন্নত গড়ে তুলতে প্রস্তুত হল।
২. বিপুল সংখ্যক লোক মূর্খতা স্বার্থান্ধতা বা বাপ-দাদার রসম রেওয়াজের প্রতি অন্ধ আসক্তির কারণে এই দাওয়াতের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।
৩. মক্কা ও কুরাইশদের সীমানা পেরিয়ে এই নতুন দাওয়াতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অপেক্ষাকৃত বিশাল বিস্তৃত এলাকায়।